'দুরবীণে ভাসা জীবন' এ কলামটি ধারাবাহিকভাবে লিখতেন বন্ধুবর আবিদ রহমান মেলবোর্ণ, অস্ট্রেলিয়া থেকে। তিনি সর্বমোট আটটি অংশ লিখেছেন। তাতে মধ্যপ্রাচ্য পাঠকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। পাঠকদের ভাবনা-মাঝ পথে লেখক থেমে গেছেন। না। তিনি থেমে যাননি। তিনি 'রাখাল' নামক একটি অনলাইন পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের 'মরুপলাশ' পাঠকদের অনুরোধে পুণরায় কলামের আটটি অংশই এক সঙ্গে প্রকাশ করা হলো। এ সঙ্গে পাঠকদের একটি অনুরোধও সম্মানিত লেখককে জানান দিচ্ছি যে, কলামটি নবম অংশ থেকে শুরু করতে পাঠকগণ বিনীত অনুরোধ জানিয়েছে। - সম্পাদক, মরুপলাশ

দুরবীণে ভাসা জীবন - ১

মেলবোর্ণ, অস্ট্রেলিয়া থেকে

আবিদ রহমান

অহংকারী ও অধৈর্য মহিলা বলতে যা বোঝায় আমার জন্মদাত্রী ছিলেন তাই। কোন কিছু একবার মাথায় এলে সেটা সেই মুহূর্তেই করা চাই। সন্ধ্যায় হয়তো কোন আত্মীয় উনাকে একপ্রস্থ কাপড় উপহার দিয়েছেন তা রাতের মধ্যেই সেই কাপড় সেলাই করে তিনি কোর্তা বানিয়ে পরতেন। অথচ হাই পাওয়ারের চশমা পরেও তিনি চোখে ভালো দেখতেন না। রাতে হয়তো মনে হলো গ্রামের বাড়ির খোঁজ-খবর নেয়া দরকার, ভোরে কাজের ছেলে দিয়ে বেবী ট্যাক্সি ডেকে সোজা সায়েদাবাদ বাসষ্ট্যান্ড। বাসে চেপে বাড়ী-তিনি ছিলেন হাই ব্লাড প্রেসার ও টারমিনাল ডায়াবেটিস রোগী। জমিদার বাড়ীর বড় মেয়ের দাপট মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছিলো উনার। মানুষকে উনি সম্মান জানাতেন বংশ পরিচয়ের মাপকাঠিতে। বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব এলে আগে খোঁজ করতেন কোন বাড়ির কার ছেলে। তাদের পারিবারিক মর্যাদার ভিত্তিতেই আপ্যায়ন-আদায়ের ব্যবস্থা হতো। এতো কিছুর পরও তিনি মানুষের বেশ পছন্দের ছিলেন দুটি কারণে। অন্যের জন্যে দয়া-মমত্ববোধ এবং অসম সাহসের জন্যে।

আমার জন্মদাত্রী জীবনের শেষ দু'টি যুগ কাটিয়েছেন আদরের মেজো ছেলের সান্নিধ্যে, শীতের দেশ সুইডেনে। তবে কখনো ছেলের গলগ্রহ হয়ে তাঁর সংসারের সুখে 'হাড়ডি' হয়ে দাঁড়াননি। পেনশনের সামান্য আয়ের ভরসায় একা থেকেছেন ছেলের পাশের বাড়ীতে যাতে করে প্রাণপ্রিয় ছেলেকে প্রতিদিন না হলেও নিয়মিত যেন দেখতে পারেন। জুনিয়র স্কুল পাশ দেয়া জন্মদাত্রীর বাংলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানা ছিলোনা- তবু তিনি একাকী থেকেছেন ভিন্নভাষী এক ভুবনে। প্রতি বছর একবার উড়ে আসতেন বাংলাদেশে, নিজের শশুরের ভিটেয়, প্রতিবেশী মানুষগুলোর খবরা-খবর নিতে। উনার আসার সংবাদে গ্রাম জুড়ে উল্লাস নামতো, যেন সাক্ষাৎ ইউনিসেফ গ্রামে এসেছে। কারোর মেয়ের বিয়ে, কেউবা অসুস্থ, কারো সদ্য তালাক হয়েছে-এমন সব মানুষগুলো ভীড় জমাতো বাড়ীর উঠোনে। দু-তিন জন কাজের মানুষসহ সংসারে মোট চার-পাঁচজন লোক। তবুও দিনে আধমণ চালেও খাওয়ায় টান পড়তো। কৃপন মানুষের জীবন-যাপন করে সুইডিশ সরকারের দেয়া পেনশনের টাকা জমিয়ে গ্রামে বিলি বন্টন করতেন। সারা বছরের ধান-চাল বর্গাচাষীদের থেকে বুঝে নিয়ে সেগুলো দিতেন প্রতিবেশী অভাবীদের। মৃত্যুর চারমাস আগে তিনি শেষবার গ্রামে গিয়েছিলেন। আমাদের এক তরুন প্রতিবেশী তখন 'বেদনার রোগী' (গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগীকে আমাদের এলাকার লোকজন বেদনার রোগী ডাকে)। তাকে কুড়ি হাজার টাকা দিলেন- চিকিৎসার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা, তিন মাসের খোরাকী ছয় হাজার টাকা। বাদবাকী নয় হাজার টাকা একটা ছোট দোকান করার পুঁজি।

চারমাস পর প্রাণপ্রিয় সন্তানের কোলে মাথা রেখে আমার জন্মদাত্রী সুইডেনে মারা যান। ভাগ্যক্রমে আমি তখন ব্যবসায়িক কারণে সপরিবারে ঢাকায়। চারদিন পর লাশ বাংলাদেশে আসবে। একমাত্র চাচাকে নিয়ে বাড়ী গেলাম কবরসহ অন্যান্য জোগাড়-যন্ত করতে। সংগে আমার প্রতিবেশী ও গ্রামের অন্যান্য শুভাকাংখীরা। তখন মশুল বর্ষার মরশুম। জলাবদ্ধতা থেকে জমির ধান বাঁচাতে কৃষকরা জমির আল কেটে দিয়েছেন। ফলে আমাদের পারিবারিক গোলস্থানে যাবার রাস্তাটায় ছোট একটা কাটা। যেকোন মানুষ হালকা লাফে পেরুতে পারবে, তবে পারিবারিক বয়োবৃদ্ধ মরুব্বীদের কথা ভেবে আমি প্রস্তাব করলাম রাস্তাটা ঠিকঠাক করার। আমার হিসেবে ১০/১৫ ঝুড়ি মাটি ফেললেই কাজ হবে। আমার জন্মদাত্রী যে তরুনটিকে কুড়ি হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন মাস চারেক আগে, সে আগ বাড়িয়ে জানালো, কাজটা এক কামলার কাজ। রাগ হলো কারণ প্রতিবেশী হিসেবে আমি এই সামান্য সহায়তা চাইতেই পারি এবং এটাই আমাদের গ্রামের রীতি-রেওয়াজে। জিজ্ঞেস করলাম, কামলার রোজ কত। তরুনটি জানালো, দৈনিক দেড়শ, কিন্তু যেহেতু কাজটা মুর্দা বাড়ীর সেহেতু দু'শ টাকা দিলেই চলবে। রাগে ক্ষোভে রাজী হলাম। আমার জন্মদাত্রী এদের জন্যে এতো করার পরও ১৫ ঝুড়ি মাটি পেতে পারেন না বিনামুল্যে?

সিদ্ধান্ত নিলাম মায়ের কুলখানি করবো এতিমখানায়। এই অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোকে খাইয়ে লাভ নেই। চাচাই সব ব্যবস্থা করলেন। নির্ধারিত দিনে খুব ভোরে বাড়ী পৌঁছালাম। পুকুর ঘাটে এক মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা। হুজুর তখনো জানেননা এতিমখানায় আম্মার কুলখানির ব্যবস্থা হয়েছে। আমাকে দেখেই সালাম দিয়ে জানতে চাইলেন, চাচীম্মার (আমার মা) কুলখানি কখন করবো। উত্তর দেয়ার আগে মনে পড়লো, মাসখানেক আগে মাওলানা সাহেবের বড় ভাইসাহেব (আসলাম ভাই) ইন্তেকাল করেছেন। পালটা জিজ্ঞেস করলাম, আসলাম ভাইয়ের কুলখানির খবর কী। মওলানা সাহেব জবাবে জানালেন, মিলাদ আমরা ঘরে ঘরে পড়ে ফেলেছি বাইরের কাউকে বলিনি। আমার চাঁদি তেঁতে ছিলো। একই সুর আমি বল্লাম, আমরাও ঘরে ঘরে মিলাদ পড়ে নেবো। তারপর বাড়ীর দিকে হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়লো, জন্মের পর আজ অবধি কোন দিন কোন মোল্লা-মৌলভীর বাড়ীতে মিলাদের দাওয়াত পাইনি। তাহলে কী মোল্লা-মৌলভীদের বাড়ীতে কারো জন্ম-মৃত্যু হয়না নাকি তাদের আল্লাহ 'মিলাদ' না পড়ার কনসেশন দিয়েছেন!

আপনারা কেউ কোনদিন কোন মোল্লা-মৌলভীর বাড়ীতে মিলাদের দাওয়াত পেয়েছিলেন? সৌভাগ্যবানরা যদি দয়া করে আমাকে জানাতেন। ----(চলবে)

দুরবীণে ভাসা জীবন - ২

হারাম ভাসে-ডুবে হালালের জলে

এখানে আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু আছেন যার সাথে বেশ উঠাবসা। সম্পর্কটা বেশ জমজমাট ও আন্তরিক। বহুবার একসাথে বেড়াতে যাবার প্ল্যান করেও পিছিয়ে যেতে হয়েছে বিভিন্ন কারণে। তবে সব কারণ উপচিয়ে যে অকারণটি মুখ্য হয়ে উঠে, সেটি হচ্ছে হারাম-হালালের বাছ-বিচার। বন্ধুটি আমার হালাল ছাড়া খেতে চান না। এ ব্যাপারে উনি আপোষহীন।

বন্ধুটিকে নিয়ে ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে যাওয়া যায়না। ম্যাকডোলানড কিংবা অন্য ফাষ্ট ফুডতো পরের ব্যাপার। তবে হালাল বলে 'নান্দোস' চিকেন খান, যদিও এই ফ্রানচাইনিজের অধিকাংশ মালিক চৈনিক কিংবা অমুসলিম। অথচ আমার কট্টর মোল্লা একমাত্র দুলাভাই বে-নামাজীর রান্না খেতেন না। হান্টিংডেল মসজিদের ইমাম সাহেব খান বলে আমার বন্ধু একমাত্র এন্ডিয়্যুভার হিলস'র 'কেএফসি' খান। অন্য কোন 'কেএফসি' তে উনার আস্থা নেই। উনাকে বোঝানো যায়না যে সব 'কেএফসি'র মুরগী একই সূত্র থেকে আসে- যতদুর জানি সব 'কেএফসি'র মুরগী যোগান দেয় 'ইংগাম'। নোবেল পার্কের হালাল মুরগীর দোকানেও 'ইংগাম'র বিশাল এক সার্টিফিকেট ঝোলে। বন্ধুটি এক দোকানের 'ইংগাম' চিকেন খেতে দ্বিধা করেন না আবার অন্য দোকানেরটায় হালাল এটা বিশ্বাস করেন না। হালাল পিৎজা খুঁজতে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য পিৎজা নিয়ে ঘরে ফেরেন। গিয়ে উনাকে বোঝানো বেশ কষ্ট। মাঝে মাঝে বেশ রাগ হয়।

গেলো বছর ডিসেম্বরে দু'জনেই দেশে গেছি। আমি গেছি ঈদের আগে। উনি ঈদের পরে। ঈদের দু'দিন পর আমার শশুর বাড়ীর এক অনুষ্ঠানের জন্যে মুরগী কিনতে বাজারে গেছি। দোকানপাট তখনো ভালো করে খোলেনি। বাধ্য হয়ে সালাদের জন্যে চিমসানো শসা-টমেটো কিনতে হলো। কোরবাণী ঈদের পর পর বলে ভাবলাম অনেকে হয়তো গরু-ছাগলের মাংস খেতে চাইবেন না, পাঁচ-ছ'টা মুরগী কিনে নেই যদি প্রয়োজন হয়! একটা মাত্র দোকান খোলা- আমিসহ বেশ কয়েকজন খদ্দের। ১৫/১৬ বছর বয়সী একটা ছেলে মুরগীর ওজন নিচ্ছে আর ভেতরে গিয়ে জবাই দিচ্ছে। অবাক ভাবলাম ছেলেটি একা একা কিভাবে মুরগী জবাই দিচ্ছে? জবাইয়ের সাথে সাথে একটা বড় ড্রামে মুরগীগুলোকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। ব্যাপারটা কল্পনায় আঁকা একাত্তরের বধ্যভুমির মতো, অসহায়ের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুবরণ। মুসলিম অধ্যুয়িত দেশে জবাই করা হয়েছে বলে মুরগীগুলো হালাল হয়েছে। কেউ কখনো জানতে চাননি জবাইয়ের আগে কলেমা পড়া হয়েছিলো কি! যে ছেলেটি মুরগীগুলো জবাই দিয়েছে সে মুসলিম ধর্মাবলম্বী বা পাক-পবিত্র ছিলো কিনা। এতসব জানা হয়নি। অবশ্য আমার মেলবোর্ণ প্রবাসী বন্ধুটি সেই অনুষ্ঠানে এসে বেশ কায়দা করে রসিয়ে রসিয়ে মুরগীর মাংস খেয়েছিলেন।

মাসখানেক পর বন্ধুটি আরেকবার আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তখন মধ্য দুপুর। পাড়ার রাস্তায় তখন ফেরী ওয়ালাদের উচ্চকণ্ঠ দাপট। শব্জি, মাছ, মুরগী বিক্রির দুরন্ত প্রতিযোগীতার মাঝে আমরা দুজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছি আর বহুদিন পর হঠাৎ করে দেখা হওয়া প্রসুতিভূর্তিকা পুরোনো প্রেমিকার সাথে গ্রাম্য এবড়োথেবড়ো পথে বন্ধুর রিক্সা ভ্রমনের রোমান্টিক গল্প শুনছিলাম। আমার শ্যালক-বধু এসে মুরগীওয়ালার সাথে পাকা কুশলী দরাদরি শেষে দু'টো মুরগী কিনলো। মুরগীওয়ালা ড্রেনের পাশে পায়ের নীচে ফেলে মুরগী দু'টোকে জবাই দিয়েই পালক ছেঁড়া শুরু করলো। তখনো মুরগী দু'টো বেশ জ্যান্ত। আমার হালাল-অন্তপ্রাণ বন্ধুটি নির্বিকার দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। ব্যাপারটা তাকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হলোনা। তবে আমার মনে হলো, হালাল ব্যাপারটি অনেকটা সুচীবায়ুর মতো। দেশের মাটিতে যেটা হালাল হয়ে যায় বিদেশের মাটিতে সেটা হালাল হয়না। অনেকে হালাল-হারামের বিষয়টিকে যতোটা না ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখেন তার চেয়ে বেশী দেখেন সামাজিক সংস্কারের মানদন্ডে। হালাল খাবার তীব্র ইচ্ছে থাকলে হারাম রোজগার পকেটে নিয়ে হালাল মাংসের দোকানে ছুটতেন না।

হংকং প্রবাস জীবনে অনেক গুনী প্রতিভার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিল। কখনো কখনো এই পরিচিত বন্ধুত্বের গন্ডিতে গড়িয়েছে, আন্তরিকতার কোমল স্পর্শে স্নাত হয়েছে। আবার অনেকের সাথে খুব উঠা বসার পরও কেনো জানিনা নিবিড় খাতির জমে উঠেনি। এ-রকম একজন মানুষের প্রসংগ। তার নামধাম বলবোনা। উত্তরবংগের এক জেলা শহরের মানুষ। গান-বাজনা আর শিল্প-সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করেছেন দীর্ঘদিন। কোনো এক বেতারের নিয়মিত শিল্পীও ছিলেন। সত্যি-মিথ্যে জানিনা, শুনেছি প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন এক মেডিক্যাল ছাত্রীকে। নিজে ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা। সে ঘরে ফুটফুটে এক কন্যাও ছিলো। জীবন-জীবিকার টানে একসময় দেশ ছেড়েছেন, ছেড়েছেন সরকারী চাকুরী, প্রেমের বিয়ে করা বউ আর নাড়ির টানের আদুরে কন্যা-সন্ত ান। বিদেশে বসবাসের মোহে বিদেশী নাগরিককে নতুন জীবন সংগীনি করেছেন। চীনা **ষন্ডাও** নিয়ে থিতু হয়েছেন হংকংয়ে।

ধরা যাক, উনার নাম, মুনসী। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা **ষন্ডাও** আয়ের সুবাদে মুনসী ভাই সারাদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। এর-ওর অফিসে কুশল বিনিময়ের নামে সময় কাটানোর ঝামেলা মেটাতেন। মুনসী ভাই চলনে-বলনে সৌখিন ও পরিপাটি-আদব-তমিজের প্রতিযোগিতায় উনাকে হারানো বেশ দুরূহ ব্যাপার। বিদেশিনী হলেও ভাবী ছিলেন অনন্য সাধারণ একজন মানুষ। বাংগালী স্বামীর খুশী ও তৃপ্তির স্বার্থে ভাবী বাংগালী ভাবীদের সাতে বেশ খোলামেলা আন্তরিক যোগাযোগ রাখতেন। নিজের চেষ্টায় কিছু বাংলা বলতেও শিখেছিলেন। বাংলা বুঝতেনও ভালো। স্বাভবিক কারণেই উইক এ্যন্ডের বাঙ্গালী দাওয়াতে মুনসী ভাই ও ভাবী ছিলেন নিয়মিত অতিথি।

কোনো ঘরোয়া দাওয়াতে গেলেও যে গিফট নিতে হয় তা আমি মুনসী ভাইকে দেখে শিখেছি। বেশ দামী গিফট নিয়ে মুনসী ভাই ঘড়ির কাঁটা ধরে সপরিবারে হাজির হতেন। উনার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে থাকতো এক বোতল ব্ল্যাক লেভেল ও এক বাক্স তাস। সন্ধ্যার পর আড্ডায় স্কচ হুইস্কি অন রকস্ গিলতে গিলতে মুনসী ভাই তাস খেলার সংগী খুঁজতেন। দাওয়াতে অবশ্যই মানুষজনের কমতি হতো না। তবে মুনসী ভাই খুঁজতেন 'জেন্যুইন প্লেয়ার' মানে যারা পয়সার বিনিময়ে তাস খেলবেন। আমরা বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি, টাকা-পয়সার বিনিময়ে তাস খেলা হচ্ছে, জুয়া। তিনি মানতেন না, মানতে চাইতেন না। তাঁর যুক্তি ছিলো ভিন্ন। প্রতিটি স্পোর্টসের এক এক কায়দা কানুন থাকে। তাসও একধরনের স্পোর্টস এবং এ-খেলার মুল আকর্ষণ টাকা-পয়সা। আমরা কেউই মুনসী ভাইর এ যুক্তির সাথে একমত হতাম না বলে, তিনি বাধ্য হয়ে আমাদের সাথে 'দুধ-ভাত' বা বাচ্চাদের তাস খেলা খেলতেন। নারীসংগও ছিলো মুনসী ভাই'র খুব প্রিয়। তিনি সুন্দরী-অসুন্দরী বাচ-বিচারের ঝামেলায় যেতেন না, তরুণী হলেই হলো। উনি কথা বলার জন্যে হামলে পড়তেন। কারো অফিসে উনার আনাগোনা বেড়ে গেলে আমরা নিশ্চিত হতাম, সেই অফিসের যুবতী কর্মচারীটিই মুল আকর্ষণ।

স্কচ হুইস্কি মুনসী ভাইকে বেশ টানলেও মুনসী ভাই বেশী টানতে পারতেন না। ঘ্রাণেই উনার অর্ধ ভোজন হয়ে যেতো। গ্লাসে ঢালা মাত্রই মুনসী ভাই'র মধ্যে এসে পড়তো একটা ভাব । স্বাভাবিক নিয়মে দু'তিন ঘন্টা আড্ডার আগে খাওয়া পরিবেশন হতোনা। তাছাড়া অনেকেই বাঙ্গালী নিয়মে ছিলেন 'লেট লতিফ'। সংগত কারণেই খাওয়া যখন পরিবেশন হতো তখন মুনসী ভাই পুরোপুরি না হলেও বেশ মৌতাত। অন্য আর সব মাতালের মতোই উনি নিজের বাব-মা ছাড়া অন্য সবাইকে গাল-মন্দ করতেন। ম্যানিব্যাগসহ নিজের জিনিষপত্র খোয়াতেন না এবং সর্বোপরি নিজের বাড়ীর রাস্তা ভুলতেন না। মৌতাত হলেও উনার সমস্যা হতোনা, কারণ ভাবী অবস্থা বেগতিক দেখলেই ট্যাক্সি ডাকতেন। টলমল পায়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বারবার হোষ্ট পরিবারকে বিব্রত করতেন, ভাই মাংসটা হালালতো? উনি হালাল নিশ্চিত না হয়ে কিছুই খেতেন না।

আমাদের আরেক ছোট ভাই ছিলো ইকবাল। চীনা ভাষা জানা ছাড়াই ইকবাল চৈনিক কাপড় প্রস্তুতকারী কোম্পানীতে মার্কেটিং ম্যানেজার ছিলো। স্থানীয়রা ইকবাল উচ্চারণ করতে পারতেন না, ওকে ডাকতেন 'আই কিউবল'। পেশাগত কারণেই ইকবাল-কে মিসরসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হরহামেশাই যাতায়াত করতে হতো। একবার কোন এক মুসলিম দেশের ডিউটি ফ্রি'তে ইকবাল আরবী লেখা মোড়কে থেকে ব্ল্যাক লেভেল পেয়েছিলো। এনেই মুনসী ভাইকে গিফট, মুনসী ভাই এবার আপনার জন্যে হালাল ব্ল্যাক লেভেল এনেছি। উত্তরে মুনসী ভাই'র তিরস্কার, মদ কখনো হালাল হয়? সোজাসাপটা ইকবালের জবাব, দেখেন না পুরো মোড়কটাই আরবীতে লেখা, হালাল না হয়ে যাবার উপায় আছে? আমরা নিয়মিত মদ্যপান করতে পারি, অন্য মেয়েমানুষের সংগে নির্দ্বিধায় ভালবাসা নির্মাণে ব্যস্ত হতে পারি, কেবল হালাল মাংস ছাড়া খেতে পারিনা কেনো? ব্যাপারটা কি ধর্মীয় নাকি প্রচলিত সংস্কার!

হারাম-হালাল কিংবা সংস্কারের প্রসংগে খুব ছোটবেলার একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। আমি তখন প্রাইমারীর ছাত্র, পুরো ঘটনাটি স্পষ্ট মনে নেই, তবে কাঠামোটা সুস্পষ্ট। আমার গ্রামের বাড়ী জগন্নাদীঘি ইউনিয়নের বিজয়করা গ্রামে। আশেপাশের গ্রামগুলোর নাম রতনপুর, লক্ষ্মীপুর, নারায়ণকরা, রামপুর। নামই বলে দেয় এক সময় এ এলাকায় হিন্দুদের দাপট ছিলো। বৃটিশ আমলে আশেপাশে বেশ কয়েকজন পাতি জমিদারও ছিলেন হিন্দু। এখনো বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত ঠাকুরবাড়ী ও ধ্বংসপ্রায় মঠের দেখা মেলে। এলাকাটি আবার ভারত সীমান্তের কোল ঘেঁসে। আমাদের এলাকার ইয়াং জেনারেশন বিকালের চা-খেতে নিয়মিত ভারতের ছোট বাজারগুলোতে যান বিডিআর ও বিএসএফ'র সাথে সখ্যতার সুবাদে।

আমাদের গ্রামের চেয়ারম্যান ছিলেন বেশ দাপটের। বেসিক ডেমোক্রেসির বা আইয়ুবী আমলে একবার ইষ্ট পাকিস্তান'র সেরা চেয়ারম্যান পেয়েছিলেন। পুরো নামটা মনে নেই। তবে পুরো জেলা জুড়ে উনার পরিচিতি ছিলো ছোট্ট মিয়া চেয়ারম্যান নামে। বাড়ীর সামনে দীঘির সাথে পাল্লা দেওয়া বিশাল এক পুকুর। সে পুকুরে লাল শরীরের মানে বেশ বড়-বড় বয়সী রুই মাছ মিলতো। জেলা সদর থেকে ডিসি-এস ডিও আসতেন বড়শী শিকারে। যার বাড়ীর দোরগোড়ায় প্রশাসন গড়াগড়ি খায় তার দাপট সহজেই অনুমেয়।

পাকিস্তান হবার পর পরই হিন্দুরা রাতের অন্ধকারে সহায়-সম্পদ সব বিক্রি করে ভারত চলে যেতে থাকে। হিন্দুদের দাবী, মুসলিম লীগের নেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে জলের দামে পৈত্রিক ভিটা বিক্রি করে তাদের চলে যেতে হয়েছে। কথাটা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য। আবার কোনো কোনো হিন্দু এক জমি তিন-চারজনের কাছে বিক্রি করে অন্যদের মাথায় কাঁঠাল ভেংগে গেছেন। তবে যে যেইভাবেই গেছে, চেয়ারম্যান-মাতব্বরদের বখরা না দিয়ে সীমান্ত ডিংগাতে পারেননি। হিন্দুদের দেশ ছেড়ে যাবার এই মহোৎসবের সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারীদের একজন ছিলেন ছোট্ট মিয়া চেয়ারম্যান।

আমাদের সাথে উনাদের সরাসরি কোন আত্মীয়তা না থাকলেও শ্রেনীচরিত্রের কারণে বেশ মিলমিশ ছিলো। উনার ভাতিজা আদর ভাই তখন নিজের চাচাকে নির্বাচনে হারিয়ে দোর্দন্ড প্রতাপের চেয়ারম্যান। সমবয়সী হবার কারণে আব্বার সাথে আদর ভাইয়ের যোগাযোগটা ছিলো নিয়মিত। সেই ছোট্ট মিয়া চেয়ারম্যান তখন মৃত্যু শয্যায়। মাসখানেক ধরে তিনি বেশ কষ্ট করছিলেন। একদিন চাটগা থেকে আমরা সপরিবারে বাড়ী এসেছি দাদা-দাদীকে দেখতে। খবরটা শুনে দাদাজানকে নিয়া আমরা গেলাম ছোট্ট মিয়া চেয়ারম্যানকে দেখতে।

ভদ্রলোক তখন কাঁটা মুরগীর মতো যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। তার বিছানার চারপাশ জুড়ে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী। দিন রাত মোল্লা-মৌলভীরা কোরআন পড়ছেন, আল্লা-বিল্লাহ করছেন যাতে ভদ্রলোকের শান্তির মৃত্যু হয়। উনার কষ্ট কারোরই সহ্য হচ্ছিলো না।

দাদাজানের কারো বাড়ীতে যাওয়া ছিলো বিরল কোনো ঘটনা। মুরীদরা পীরের বাড়ী যায়, পীরতো আর মুরীদের বাড়ীতে যায় না! অবশ্য ছোট্ট মিয়া চেয়ারম্যান বা তার সম্প্রসারিত পরিবারের কেউই দাদাজানের মুরীদ ছিলেন না। তবে অন্য আর সব মানুষের মতোই উনারা দাদাজানকে পীরের সম্মান দিতেন। দাদাজান খানিক দোয়া পড়লেন, ঝাঁড়ফুক দিলেন, দক্ষিণের জানালা খুলে দিয়ে উনাকে উত্তরমুখী করে শোয়ানের পরামর্শ দিলেন। কিছুতেই কিছু হচ্ছিলনা। ওখানে আরেকজন আলেম ছিলেন, যিনি সদ্য মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ। ভাগ্যক্রমে আমাদের গ্রামেই উনার শশুরবাড়ী।

সবার কৌতুহলী নজর এড়িয়ে দাদাজান আর সেই আলেম মিলে বেশ খানিকটা সময় ধরে গোপন সলা-পরামর্শ করলেন। তারপর দাদাজান কাকে যেন ডেকে বললেন একটা পরিস্কার বেতের পাটি এনে উঠোনে বিছাতে।

দাদাজানের নির্দেশে প্রবল পরাক্রমশালী ছোট্টমিয়া চেয়ারম্যানকে কয়েকজন আত্মীয়স্বজন মিলে শিশুর মতো তুলে এনে উঠোনে উত্তরমুখী করে শোয়ালেন (মুসলমানদের কবর উত্তরমুখী হয়)। দাদাজান কয়েকজন আলেম নিয়ে জোরে শোরে কোরআন তেলওয়াত করতে শুরু করলেন। মিনিট পাচেকের মাথায় ছোট্ট মিয়া চেয়ারম্যানের যন্ত্রণা লাঘব হতে থাকলো আর মনে হচ্ছিলো তিনি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার আর কোন ব্যাথা-বেদনা নেই। মিনিট কতক পর মোল্লা-মৌলভীদের কণ্ঠে শুনলাম, 'ইন্না লিল্লাহে.......... রাজেউন।

পরে জেনেছি, ঘরে যে খাটটায় তিনি শুয়ে ছিলেন, সেটা জমিদার শশীনারায়ণের মায়ের শখের খাট ছিল। তিনি যখন গায়ের জোরে খাটটা তুলে আনছিলেন তখন বৃদ্ধা নাকি অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'এই খাটে তোর কষ্টের মৃত্যু হবে'। সবই লোকমুখে শোনা। ব্যাপারটা হয়তো কাকতলীয়। হতে পারে হারাম-হালালের সংস্কার। পারে না?
----(চলবে)

দুরবীণে ভাসা জীবন – ৩
'দেশে' যাবার দায়বদ্ধতা !

জীবন-জীবিকায় দেশের সাথে বনবাসী হয়েছি প্রায় দুই যুগ। তবে 'নিয়মিত' দেশে যাই, দেশে যেতেই হয়। বিরহের প্রথম দিকে এই যাওয়া ছিল ষান্মবাৎসরিক। হালে ব্যাপারটি দ্বি-বার্ষিক। এক যদি নিয়মিত বলা যায়, তাহলে দেশের সাথে আমার যোগাযোগ নিয়মিত। এর বাইরে একমাত্র ভরসা শশুরবাড়ী। কারণ প্রায় প্রতিরাতে ভাই-বোনদের সাথে ফোনে কথা না বললে আমার স্ত্রী নিদ্রাহীনতায় ভোগেন। সেই বাড়ীর নিউজ হেডলাইনগুলো আমাকে অবশ্যই শুনতে হয় গভীর মনযোগে, তবে "এক চোখা সেন্সরড ভার্সন"।

আমার শশুরপক্ষ রাজধানী ঢাকাতে স্থায়ী মাথা গোজার ঠাঁই করেছেন। প্রবাদ আছে, ভদ্রলোকদের রাজধানীতে বাড়ী থাকে। আমার পরিবার বোধকরিভদ্রলোকের সংজ্ঞায় পড়েনা। তারা এখনও হয় গ্রামবাসী, নাহলে বড়জোর মফস্বলের পৌর-নাগরিক। কিছুদিন আগেও রক্ত-সমন্ধীয়দের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ডাকঘর: জুন মাসের পারিবারিক কুশলাদি জানতে হতো জুলাইয়ে। মাঝে-মধ্যে পুরোটা পড়া যেতোনা বেদনাদায়ক হস্তাক্ষরের কারণে। ই-মেল যুগের সাথে আমার পরিজন এখনও পরিচিত হননি, কখনো হতে পারবেন কিনা জানিনা!

স্ত্রীর নজর এড়িয়ে মাঝে মধ্যে আত্মীয়-স্বজনরা কথা বলে, ওরা বলে আমি শুনি- অবিকল বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া সরকারের গল্প: এ-গল্প তাদের অভাব-অনটনের করুন কাহিনী। আমার ফোন বিলের শ্রাদ্ধ করে, ইনিয়ে-বিনিয়ে তারা ক্রমাগত বলে যায়, সাহায্য-সহযোগিতা চেয়ে যায়, আমি ধৈর্য্যের সাথে শুনি। যে সকল মানুষের সংগে আমার কখনো পরিচয় হয়নি কিংবা পরিচয় ছিলনা, টেলিফোনে বারবার শুনতে শুনতে তাদের চিনে ফেলি। মাঝে মধ্যে বিরক্তি ধরে, রাগও হয়, পরমুহূর্তে সামলে নেই, আমিও যদি ওদের কথা না শুনি, তাহলে ওরা কার কাছে দাঁড়াবে, কোথায় যাবে! সমাজ-দেশ-সরকার কেউইতো তাদের কথা শুনেনা, শুনতে চায়না। শোনার আরোও একটা কারণ আছে, সেটাই মুখ্য কারণ-বাংলাদেশ থেকে আসা ফোনকে আমি ভীষণ ভয় পাই। দেশ থেকে আমার ফোন আসে দু'কারণে। হয় ঘনিষ্ট কারো মৃত্যুর সংবাদে নাহলে 'আশু' টাকার প্রয়োজনে। কখনো কোন সুসংবাদ কিংবা কারো জন্মের খবর দিতে দেশ থেকে কেউ আমাকে ফোন করেনা, করেনি অবধি।

আমরা যারা প্রবাসী, তারা নদী-ভাংগা মানুষের মতো জীবনের নির্মম প্রয়োজনে বারবার ঠিকানা বদলাই- বোধকরি প্রবাসীদের জীবন যাযাবরের জীবনের মতো পিচ্ছিল, নুড়ি পাথরের মতো গড়ানো, চলার মধ্যেই থাকে, কোথাও থামেনা। কেবল মৃত্যু বা ধ্বংস এসে থামায়, তখন চিরতরেই থামে প্রবাসীর যাযাবর জীবন। আমাদের প্রজন্মের প্রবাসীদের অধিকাংশের যাত্রা শুরু অজপাড়া গাঁও থেকে। টিমটিমে বাতির মফস্বল ছুঁয়ে আমরা রাজধানী ঢাকাকে প্রথম নিবাস করি সুসভ্য নাগরিক হবার মোহে। প্রবাসী হবার পর ঢাকার মোহ আরো বাড়ে, প্রবাসের আধুনিক জীবনধারায় অভ্যস্থদের জন্যে গ্রামে রাত্রিবাস কল্পনাতীত এক দুঃস্বপ্ন, সেই নিরিখে রাজধানী ঢাকা মন্দের ভালো। তাই আমাদের কাছে দেশ মানে আদি ও অকৃত্রিম রাজধানী ঢাকা, দেশে যাওয়া মানে ঢাকায় যাওয়া, ঢাকায় থাকা। অবশ্যই আমরা গ্রামের বাড়ী যাবার কষ্টকর প্রক্রিয়া থেকে বিরত হইনা, অন্তঃত একবার হলেও বাবা-মা'র কবর জেয়ারত করে আসি, ঘাটলায় বসে প্রতিবেশিদের সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হই, রাতের

আধারে পুকুরের মাছ চুরির গল্প শুনি, নিজ গাছের কাঁচা নারিকেলের পানি খাই এবং সবশেষে দিনে দিনে অস্থায়ী বসত ঢাকায় ফিরে এসে শেষ করি 'দেশে' যাবার দায়বদ্ধতা। ----(চলবে)

দুরবীণে ভাসা জীবন – ৪

দায়বদ্ধতা !

একবার নাটকের টিকেট বিক্রির ধর্ণা দিচ্ছিলাম বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে। এই সুবাদে অনেক ভিন্ন ধাঁচের মানুষের সাক্ষাৎ মিলেছিলো। অবশ্য তখনো মেলবোর্ণের বাঙ্গালী সমাজের সাথে পুরোপুরি পরিচয় নেই। কেবল নেতৃস্থানীয়দের নাম-ধাম জানি, আর চেনা-শোনা আছে বড় ভাইয়ের বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে। এভাবে আমি অনেককে চিনি-জানি উনারা অবশ্য আমাকে চেনেনও না- জানেনও না। আমিতো আর নেতৃস্থানীয় কিংবা সাংস্কৃতিক দিকপাল নই! আমি হচ্ছি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কামলা। আমার মতো আরো কয়েকজন খেটে দেন, 'প্রতিভারা' সেই খাটাখাটুনির প্ল্যাটফর্মে মাইক্রোফোন হাতে লম্পজম্প করে থাকেন।

রক্ষনশীল হিসেবে মেলবোর্ণে বাংগালীর সংখ্যা ৯ (নয়) হাজারেরও বেশী। অবশ্য এই সংখ্যার সিংহভাগ ছাত্র। তবে টিকেট কিনে অনুষ্ঠানে আসা বাঙ্গালীর সংখ্যা শ'খানেকেরও নীচে। অবশ্য যদি শাবনুর কিংবা রুনা লায়লার অনুষ্ঠান হয় তখন অনুষ্ঠানে হাজিরা দেওয়াটা ইজ্জতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক বিনে পয়সার সামাজিক অনুষ্ঠানে এক মুখ চেনা ডক্টরেট ভদ্রলোকের সংগে দেখা, ওখানে লোকজন 'ওয়ান ডিশ' নিয়ে আসেন। না আনলেও সমস্যা নেই, আয়োজকরা পর্যাপ্ত খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। ভদ্রলোক বেশ উঁচুপদের সরকারী চাকুরী করেন। উনার চাকুরীও বেশ লোভনীয় বেতনের। দু'জনের মিলিত রোজগার ছয় অংকের ঘরে। এদেশে এসেছেন বছর সাতেক।

পরে শুনেছি, উনি কোনো দাওয়াতে যান না কিংবা কাউকে দাওয়াত দেন না। উনারা বাড়ী কিনবেন বলে সেভিংস করছেন। ভদ্রলোক যে গাড়ী চালান, তার 'প্রাইভেট সেল' মূল্য হবে বড়জোর এক হাজার। আমি ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম পঁচিশ ডলার দিয়ে একটা ফ্যামিলি টিকেট কিনতে। ভদ্রলোকের বিনীত উত্তর, 'ভাই, এখানে আপনাদের দু'টো নাটকের দল। আপনার টিকেট কিনলে উনাদেরটাও কিনতে হবে। সব মিলিয়ে বছরে ৫০/৬০ ডলার খরচ। বছরে এতগুলো টাকা এ্যফোর্ড করাতো ভাই সম্ভব নয়। অনেক কথা চালাচালির পর ভদ্রলোক জানালেন, উনি এদেশে এসেছেন কমফোর্টেবল লিভিংয়ের জন্যে।

আমার রাগ হলো, বল্লাম, ভাই যদি বছরে ৬০ ডলারই করচ করতে গিয়ে আপনার 'কমফোর্টেবল লিভিং' বিনষ্ট হয় তাহলে বাংলাদেশে ফেরৎ গিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর চাকুরীটা আবার নেন না কেনো? ভদ্রলোক আমতা আমতা উত্তর শুনে আমার মাথা গরম মেজাজ আরো বড়ে গেলো। বল্লাম, আপনি যে গাড়ীতে বউ-বাচ্চা নিয়ে শীতে-গরমে ঘুরে বেড়ান তাকে আর যাই বলেন, কমফোর্টেবল লিভিং বলে শব্দটাকে অপমান করবেন না। ছয়-সাত বছর এক ঘরে থেকে আপনি কী কমফোর্ট পাচ্ছেন জানিনা। অন্য এক ঠোঁটকাটা বড়ভাই পাশ থেকে টিপ্পনী কাটলেন, ওনারা এখানে আসেন ফ্রি খাওয়ার লোভে। আমি নিশ্চিত উনি কোনো ডিশ আনেন নি। ভদ্রলোক এমনি মিনমিনে স্বভাবের, টিপ্পনি শুনে একেবারে মিহিয়ে গেলেন, সবসময়েইতো কিছু না কিছু আনি, আজ আপনার ভাবীর কাজ ছিলোতো, তাই কিছু আনতে পারেনি।

এই ভদ্রলোকের কথা শুনে যদি আপনার খারাপ লাগে। অন্য ভদ্রলোকদের কথা শুনলে নিশ্চয় আপনার চাঁদি তেঁতে উঠবে। বুশ ফায়ার এ্যাপিলের সময়কার কথা। এক ভদ্রলোকের কাছে কুড়ি ডলার চাইলাম। ভদ্রলোক বেশ রসিয়ে আমার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ডলার দিলেন না। বারবার তাগাদা দেওয়ার পর উনি জানালেন, উনাকে অনেক সোস্যাল কমিটমেন্ট মেটাতে হয় তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও উনি আমাকে কোনো সাহায্য করতে না পারার জন্যে দুঃখিত। উনার বাচ্চা-কাচ্চা তিনটে। দীর্ঘদিন 'হেলথ কেয়ার কার্ডের' মালিক ছিলেন। সজ্ঞান্ধষক বেকারও ছিলেন দীর্ঘসময়।

বল্লাম, ভাই এদেশ আমাকে-আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে, এদেশের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা কী আমাদের কর্তব্য নয়। গত আট বছর এদেশের সরকারের কাছ থেকে বাচ্চাদের নামে, হেলথ কেয়ার কার্ডের

সুবাদে, বেকার থাকার কল্যাণে কমবেশি পনেরো-বিশ হাজার ডলারতো খেয়েছেন, এর এক পার্সেন্ট বা দেড়শ ডলার দেয়া কী উচিত না? ভদ্রলোক খানিকটা মেজাজ চড়িয়ে বল্লেন, ভাই আমার অবস্থাটাতো বোঝার চেষ্টা করবেন। আমার অনেক সোস্যাল কমিটমেন্ট- প্রতি মাসে মাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাতে হয়। বছরে একবার বড়ভাইয়ের দুই ছেলে-মেয়েকে কাপড়চোপড় দিতে হয়। এতসব খরচের পর হাতে কোন সেভিংস থাকে?

নিজের জন্মদাত্রীর ভরণপোষনকে যে মানুষ সোস্যাল কমিটমেন্ট হিসেবে দেখেন, তাঁর সাথে আমার আর কোনো কথা বলার প্রবৃত্তি হলোনা। যে মানুষ নিজের মা-মাটি ও মানুষ এবং রক্তসম্পর্কীয়দের 'লায়বেলিটি' মনে করেন, তিনি অন্য একটি দেশের মানুষের মানবিক প্রয়োজনে কতটুকু সাড়া দেবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আরেক ভদ্রলোক সদ্য বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন। বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীদের জন্যে এনেছেন বে আকর্ষণীয় গিফট- গিফটগুলো হস্তান্তরের জন্যেই আমাদের সকলকে ডেকেছেন নৈশভোজে। টেবিল ভর্তি হরেক রকম খাবার। দু'তিন রকমের ডেজার্ট। খাওয়া দাওয়া শেষে উইক এ্যন্ড নাইটের আড্ডায় বসলাম।

বাংলাদেশের রাজনীতি ইত্যাকার বিষয়ে অনেক গাল-গল্প হলো। তারপর হঠাৎ করেই এলো উনার পরিবারের কুশলাদির প্রসংগ। ভদ্রলোকের বাবা অনেক আগেই গত হয়েছেন। ঢাকার কাছের এক ছোট্ট জেলা শহরে উনার মা ও ভাইবোন থাকেন। গ্রামের বিশাল কৃষি আয় আর বাড়ী ভাড়া দিয়ে উনাদের দিন চলে যায়। কারো রেমিট্যান্সের উপর উনার মা-কে নির্ভর করতে হয় না। ভদ্রলোকের শশুরবাড়ী উত্তরবঙ্গের অজপাড়া গাঁয়ে। পরিবারের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত হলেও আর্থিকভাবে অতটা স্বচ্ছল নন। তাছাড়া পরস্পর পরস্পরের সাথে তেমন যোগাযোগও রক্ষা করে চলেন না।

ভদ্রলোক সপরিবারে মাসখানেকের উপর দেশে ছিলেন। উনি সময়ের অভাবে তিন ঘন্টার বাস যাত্রায় হার্টের রোগী মা-কে দেখতে যেতে পারেন নি। ঢাকায় উনার বড়বোনের মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিন-চারদিন, উনার বাল্যবন্ধুর ছেলের বিয়ে-সাদীর ব্যস্ততায় সপ্তাহখানেক এবং সর্বোপরি শাশুড়ীর চোখের ছানির অপারেশনে উনার সাত-আট দিন সময় চলে গিয়েছিলো। তাছাড়া ভার্সিটি জীবনের বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীর দাওয়াত-সাওয়াতে ঢাকা সফরের পুরোটা সময় পার হয়ে গিয়েছিলো। উনি অবশ্য মা-কে খবর দিয়েছিলেন ঢাকায় এসে উনার সাথে দেখা করার জন্যে। কিন্তু সদ্য স্ট্রোক করা শরীর নিয়ে উনার মা ঢাকা আসার সাহস করেননি। তাই এ-যাত্রায় মা-র সংগে উনার দেখা হয়নি।

আপনারা দেশে বেড়াতে গেলে কী 'সোস্যাল কমিটমেন্ট' কিংবা 'লায়বেলিটি' মা-কে দেখতে ভায়রা ভাইয়ের গাড়ীতে চেপে পাঁচ-ছ'ঘন্টার ঝক্কিমার্কা রাস্তা ভাংগেন। ----(চলবে)

দুরবীণে ভাসা জীবন – ৫

'সাংবাদিক'

নিজের হাসির মতোই নির্মল, আন্তরিক ও খোলামেলা কবি রফিক আজাদের হৃদয়। ছিয়াত্তরে যখন প্রথম ঢাকা শহরে কবি হতে আসি, তখন হাতে গোনা যে ক'জন কবির সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল, কবি রফিক আজাদ তাদের অন্যতম। সম্পর্কটা কখনোই কেনো জানিনা গভীরতার দিকে না গিয়ে 'অসম্ভবের পায়ে' আটকে পড়েছিলো। তখন আমাদের মতো উঠতি কবিদের একমাত্র স্বপ্ন ছিলো বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরাধিকার'-এ লেখা ছাপা। আর রফিক আজাদ সেই উত্তরাধিকার'র সহ-সম্পাদক! অবশ্য সেই সময়কার বাংলা একাডেমীর সবাই-কবি আসাদ চৌধুরী, কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা, আবৃত্তিকার ফরহাদ খান, কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম, সকলেই ছিলেন সজ্জন, বন্ধুবৎসল ও উদার। আমাদের প্রজন্মের বেড়ে উঠার পেছনে উনাদের অবদান অতুলনীয়। মনে পড়ে রফিক আজাদের রুমেই 'অলৌকিক স্টীমার' খ্যাত কবি হুমায়ুন আজাদের সংগে প্রথম পরিচয়।

সালটা বিরাশি বা তিরাশি হবে। দেশ জুড়ে এরশাদের সামরিক শাসন। ততদিনে প্রথমা গিননির ছেঁড়া পেটিকোটে দুঃখে বেশি মাইনের টানে রফিক আজাদ যোগ দিয়েছেন ইত্তেফাক গ্রুপের সাপ্তাহিক 'রোববার'-এ। সম্পাদক স্ব-খ্যাত রাহাত খান। রফিক ভাইয়ের সংগে আছেন চির অমায়িক চিত্রশিল্পী কাজী হাসান হাবীব, ভুল বোঝার মতো ব্যবহারের সদাহাস্যময় কবি ইকবাল হাসান, চিরতরুন-তুমুল-তুখোড় ইমদাদুল হক মিলন। লেবু-চা আর ওনাদের আড্ডার টানে আমরা চুটতাম ইত্তেফাক ভবনে। অবশ্য মনের গহীন কোনে লুকিয়ে থাকতো লেখা ছাপাবার দুর্নিবার ইচ্ছে। যাওয়া-আসার মাঝে কখন যেন উনাদেরই একজন বনে গেছি মনে নেই। যখনি হাত

টানাটানি হতো তখন রফিক ভাই বা মিলন ভাই অনুবাদের কিছু একটা গছিয়ে দিতেন। ৫০/৭৫ টাকা তখন আমাদের মতো তরুনদের জন্যে অনেক। স্টার সিগারেটের প্যাকেট তখন দেড় টাকা। দুপুরে ভর পেট খেতে লাগে পাঁচ টাকা।

এর কিছুদিনের মধ্যে আমরা একঝাঁক তরুন প্রেসিডেন্ট জিয়ার পত্রিকা 'দৈনিক দেশ'-এ ঢুকে পড়ি। কবি সমুদ্রগুপ্তের নিপুন মাষ্টারীর গুনে তিন মাসের মাথায় আমি পুরো দস্তুর রাতের শিফটের সাব-এডিটর। রয়টার, এপি, এএফপি, বাসস-এর অনুবাদের পাশাপাশি আমি শিল্প-সাহিত্যের মোষ তাড়াই সাহিত্য সম্পাদক কবি হেলাল হাফিজের টেবিলে। কখনো দৈনিক বাংলায় কবি আহসান হাবীব কিংবা সহকারী কবি নাসির আহমেদের রুমে। তবে দৈনিক বাংলা ভবনে আমাদের বেশী টানতেন কিংবদন্তি প্রচ্ছদশিল্পী সৈয়দ লুৎফল হক। আমাদের শুন্য পকেটের দিনগুলোর মধ্যাহ্নভোজগুলো ছিল লুৎফল হকের অবদান। অনুবাদের কাজটায় তত দিনে আমি বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছি।

পৈত্রিকসূত্রে কিছু পুরোনো রিডার্স ডাইজেষ্ট পেয়েছিলাম। আমার পাল্লায় পড়ে ওগুলোর দাম উঠে গিয়েছিলো। সাপ্তাহিক রোববার তখন 'আমাদের জেলা' নামে একটা ধারাবাহিক প্রচ্ছদ কাহিনী করছিলো। দৈনিক দেশ-এ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ছিলেন সহপাঠী বন্ধু মির্জা তারেক। বেচারা বুয়েটের জনসংযোগ বিভাগের লোভনীয় চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে এখন মিডিয়া সাংবাদিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হাবুডুবু সময় কাটাচ্ছেন। তারেক আমাকে কী এক অদ্ভুত কারণে আব্বু ডাকে। আমি ডাকি পুত্র।

আমাদের দুজনেরই তখন টাকার বেশ টানাটানি চলছিলো। তিন বেলা বাংলা মদ, ইউনোকটিন আর গাঁজা-চরসের নেশা মেটানোর পর বেতনের তেরোশোত চল্লিশ টাকায় কিভাবে মাস কাটে! তারেক অবশ্য এসব কিছু মুক্ত, সুবোধ বালক। তবু সেসব দিনগুলোতেও বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারের সাড়ে তিনশ টাকায় স্বচ্ছল জীবন-যাপন সম্ভব হতোনা। নয় হাজার টাকার লোভে কবি রফিক আজাদের দরোজায় ধর্ণা দিলাম। কাজটা পেয়ে গেলাম। সংগে সম্পাদক রাহাত খানের 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' মার্কা চিঠি।

নোয়াখালী তারেকের নিজের জেলা শহর। অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। তাছাড়া আমাদের 'দৈনিক দেশ'র জেলা প্রতিনিধি জুবায়েরতো আছেই (নামটা ভুল হলে মাফ করে দেবেন)। আমি নিজেও নোয়াখালী জেলাটা বেশ ভালোই চিনি একজন ব্যারিষ্টার মন্ত্রীর কল্যাণে। মন্ত্রী মহোদয়ের সাতে বহুবার নোয়াখালী এসেছি। এছাড়া আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রেস সচিব ও সাবেক সাংবাদিক আহমেদ নজীর ভাইয়ের অকাতর সহানুভূতি। আটসাট বেঁধে এক সন্ধ্যায় নোয়াখালী পৌঁছালাম। তখন একমাত্র জনপ্রিয় পত্রিকা ইত্তেফাক। ইত্তেফাক গ্রুপ থেকে এসেছি বলে কথা! কোন কথাবার্তা ছাড়াই সোজা সার্কিট হাউজে। আগে খবর দেওয়া ছিলো কিছুক্ষণের মধ্যে 'দৈনিক দেশ' প্রতিনিধি জুবায়েরের ফিফটি সিসি মোটর সাইকেলে পেছনে চেপে ইত্তেফাকের প্রতিনিধি এসে হাজির। এর আগে অবশ্য এসে হাজির হয়েছে আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধু অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক অবয়ব সম্পাদক হাসিখুশী হাসেম।

রাতের মধ্যেই জুবায়ের পুরো নোয়াখালী জেলা প্রশাসন গরম করে ফেললেন। আমাদের দু'জনের জন্যে ফুল টাইম একটা গাড়ী, ভালো খাবার-দাবার ইত্যাকার ব্যবস্থার দাবীতে খোদ জেলা প্রশাসককে তটস্থ করে ফেললেন জুবায়ের। মফঃস্বল সাংবাদিকদের দাপটের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু চর্ম চক্ষে এই প্রথম দেখা। দিন দশেকের মতো আমরা নোয়াখালীতে ছিলাম। প্রতিরাতে সব পত্রিকার মফঃস্বল সংবাদদাতাদের সাথে আমরা নিবিড় আড্ডায় ব্যস্ত হতাম। তখনকার মফঃস্বল সংবাদদাতারা কোন নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পেতেন না।

বড় কাগজের উনারা বড়জোড় লাইনেজ পেতেন অর্থাৎ সংবাদ ছাপার বিপরীতে মুদ্রিত লাইন অনুযায়ী পয়সা। বিনে পয়সার এই চাকুরী অনেকে করতেন মান-সম্মানের জন্যে। অনেকে প্রশাসনকে প্রভাবিত করে ব্যবসা বানিজ্য বাগাতে সাংবাদিক হতেন। অগ্রজপ্রতিম সহকমী গল্পকার ও অধ্যক্ষ দেওয়ান আজরফের সুযোগ্য পুত্র আবু সায়ীদ জুবেরীর অবর্তমানে সপ্তাহখানেক মফঃস্বল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিলো। মফঃস্বল প্রতিনিধিরা 'ভুল করে' ফাইভ ফিফটি ফাইভ'র প্যাকেট টেবিলে ফেলে যেতেন। অফিসে ঢুকেই নিউজ ডেস্কের সবার জন্যে কাবাব-পরোটা-পুরি-চা আনাতেন।

মফঃস্বল সাংবাদিকরা নিজেদের ভাবেন ডিসি সাহেবের সমকক্ষ। আমাদের মতো ঢাকা থেকে আগত সাংবাদিকরা ওনাদের চোখে মন্ত্রী-মিনিস্টারের সমতুল্য। আমরা 'দৈনিক দেশ' এর ঢাকার সাংবাদিক আর জুবায়ের 'দৈনিক দেশ'এর নোয়াখালীর জেলা সংবাদদাতা। তাই আমাদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় নিয়ে দিনে দু'তিনবার জেলা প্রশাসককে মোটামুটি হামলে পড়তেন। বেচারা জুবায়েরতো জানতেন না, জেলা প্রশাসক কাশেম সাহেব 'দৈনিক দেশ'এর নতুন মালিক সাবেক মন্ত্রী মাইদুল ইসলামের ভগ্নিপতি এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের একজন। পরে কাশেম

সাহেব যখন চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে 'দৈনিক দেশ' এর সম্পাদক হয়েছিলেন তখনো জুবায়ের নোয়াখালীর জেলা সংবাদদাতা।

অপারেশন ক্লিন হার্টের কিছু সময় পর এক জেলা সদরে এক মাঝারী গোছের সন্ত্রাসী ধরা পড়লো। সেদিন হয়তো লীড নিউজের আকাল ছিলো। মোটামুটি সবগুলো দৈনিকের প্রথম পাতায় ছবিসহ সন্ত্রাসীর ছবি ছাপা হলো। পরের দিন এক পত্রিকার সাথে পাল্লা দিয়ে আরেক পত্রিকায় সেই সন্ত্রাসীর অপকর্মের কাহিনী ছাপা হতে থাকলো। জেলা সংবাদদাতাদের সংগে যুক্ত হলো ক্রাইম রিপোর্টারদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। দেশের পাঠক হামলে পড়লো এই 'নব্য গড ফাদারের' কাহিনীতে। পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালে মনে হতো ঐ সেই সন্ত্রাসী যেন 'আরেক দাউদ ইব্রাহিম'। কল্পনাকে হার মানায় এমন সব তথ্য প্রকাশিত হতে থাকলো নির্ভরযোগ্য সুত্রের বরাত দিয়ে এবং তদন্তের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পত্রিকার পাতায় ছাপা হতো না, তবে নিশ্চয় পাঠকের কৌতুহল বাড়িয়ে তুলতো পরের দিনের সংবাদপত্রের জন্যে।

বাদবাকী কাহিনী আমার এক অনুজপ্রতিম মফঃস্বল সাংবাদিকের মুখে শোনা। তিনদিনের রিমান্ডের পর ঐ সন্ত্রাসীকে আদালতে তোলা হচ্ছিলো। পুরো আদালত প্রাঙ্গান জুড়ে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের ভীড়। সন্ত্রাসীর এক চেলা সেই সাংবাদিককে এক কোনে ডেকে নিলো। এক্সক্লুসিভ খবরের আশায় সেই সাংবাদিক অনুজ তখন সেই শিষ্যের সাথে পারলে দুনিয়ার ওপারে যায়। শিষ্যটি সেই সাংবাদিকের হাতে নগদ কুড়ি হাজার টাকা গুজে দিয়ে বললো, ভাই, একটা ছোট্ট অনুরোধ রাখতেই হবে। প্লিজ না বলবেন না। এতগুলো টাকা কেউ হাতের মুঠোয় গুজে দিলে তাকেতো মুখের ওপর না বলা যায়না! শিষ্য যা বললো, তাতে পিলে চমকে উঠে- ভাইর সম্পর্কে কিন্তু দু'একটা কথা বাড়িয়ে লিখতে হবে। যেমন ধরুন; ভাই তিনটে মার্ডার করেছেন।

দু'তিনটে রেপও জুড়ে দিতে পারেন। কয়েকটা গুম কেস লাগিয়ে দিলে ব্যাপারটা আরো বেশী পাকাপোক্ত হবে। শুনেতো সেই সাংবাদিক থ- ব্যাটা উজবুক নাকি, যা বলছে তার অর্থ জানে, মাথা ঠিক আছে কী? সাংবাদিক বন্ধুটিকে চিন্তিত দেখে শিষ্য বললো, ভাই কাজটা কিন্তু করতে হবে। এখন আমাদের এতো রোজগার নেই। টেলিফোন করলে বড় জোর পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া যায়, আপনি যদি ঠিকঠাক মতো লিখতে পারেন, তাহলে ভাইর এক ফোনে তিরিশ হাজার টাকা উশুল। থানা-পুলিশ লেভেলেও ভাইর স্ট্যাটাস বেড়ে যাবে। বলতে পারেন, ভাইর জন্যে আপনার লেখা হবে বিজনেস প্রমোশন। বলতে পারেন, আমাদের 'সম্বাদিক' ভাইয়েরা বুঝে না বুঝে কত সন্ত্রাসীর বিজনেস প্রমোশনে নিরলস ভূমিকা রেখেছেন? ----(চলবে)

দুরবীণে ভাসা জীবন – ৬

নাক তোলা মানুষ

ছোট বেলায় পশ্চিম বংগের মানুষ নিয়ে বেশ কৌতুক শুনেছি- সব কটি কৌতুকের মুল প্রতিপাদ্য ছিলো পশ্চিমবংগের দাদা-দিদিদের কাজ-কারবার। বড় হয়ে জেনেছি পুরোটাই গাল-গল্প নয়, বেশীর ভাগ সত্যির সাথে কিছুটা রস মেশানো। চাঁটগায় আমাদের এক নিকট প্রতিবেশী ছিলেন অজয় দাশ। বেশ আলাপ পরিচয় ছিলো- উনার পুরো পরিবার সাতচলিশ সালে ভারত চলে গেছেন। কী ্কে অদ্ভুত কারণে উনার যাওয়া হয়ে উঠেনি। অজয় বাবুর মুখে সারাক্ষণ তাঁর দাদা-দিদির কিচ্ছা। শুনতে শুনতে এক সময় মনে হতো ওনারা বোধহয় আমাদেরই দাদা-দিদি।

আমাদের আরেক নিকট প্রতিবেশী রহমত ভাই (ক্যাপটেন, বর্তমানে লস এঞ্জেলস্বাসী) মেরিন একাডেমী পাশ দিয়ে জাহাজের ক্যাডেটের চাকুরী পেলেন বাংলাদেশ শিপিং লাইনসের এক জাহাজে। জাহাজের নামটা মনে নেই, তবে মনে আছে সালটা ১৯৭৮ আর জাহাজটা চাটগাঁ-সিংগাপুর-কলকাতা রুটে নিয়মিত চলাচল করতো। অজয় বাবু সংবাদটা পেয়ে বেশ উৎফুল, রহমত ভাইয়ের হাতে চিঠি ও ঠিকানা দিলেন, পইপই করে অনুরোধ করলেন যেন উনার দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে আসে। সকালে যাবে, সারাদিন থাকবে-খাবে, রাতের ভোজন শেষে তারপর তোমার জাহাজে ফিরবে। বাংলাদেশের মানুষ অজয় বাবু কি তখন জানতেন পশ্চিম বংগের মানুষ কেমন হয়!

যথারীতি একদিন রহমত ভাইয়ের জাহাজ কলকাতা বন্দরে ভিড়লো। সম্ভবতঃ তখন কলকাতার সিনেমা হলগুলোতে 'ববি' চলছিলো। ক্যাডেটের চাকুরী-জাহাজের সবাই ক্যাডেটের উপর মাতব্বরী করে। বড় ক্যাপ্টেন

ছুটি ম্যানেজ করলেন রহমত ভাই ও তার অন্য আরেক ক্যাডেট বন্ধু। দু জনের কেউই কখনো হিন্দি সিনেমা দেখেননি। কেবল হিন্দি সিনেমার গল্প শুনেছেন। প্যান করলেন আজ 'ববি'র ম্যাটেনি শো মারবেন। কারণ কাল রাতেই জাহাজ কলকাতা ছাড়বে। এদিকে অজয় বাবুর দাদার বাড়িতে না গেলে চাটগাঁয় মুখ দেখানো মুশকিল হয়ে পড়বে। খালি হাতে যাওয়া উচিত হবেনা ভেবে জাহাজের কুককে পটিয়ে বড় দুটো ইলিশ মাছ সাথে নিলেন। জাহাজের এজেন্টের গাড়ীতে চেপে গেলেন অজয় বাবুর দাদার বাড়ীতে। সেই বাড়ীতে দুপুরে খাবেন বলে জাহাজে কিছুই খেলেন না। ইলিশ দুটো দেখে অজয় বাবুর দাদা-বৌদির সেকি উলাস আর আনন্দ। কিছুক্ষণ গল্প-গুজব হলো। খাবারের নাম গন্ধ নেই। এদিকে ম্যাটেনি শো'র সময় ঘনিয়ে আসছে। রহমত ভাইর বন্ধু লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে জানালেন, তাদের আধঘন্টার মধ্যে উঠতে হবে। শুনে অজয় বাবুর বৌদি বলেন, যাও ভাই, এবার না বলে এলে, আগামীবার আসলে কিন্তু চা-নাস্তা খেয়ে যেতে হবে।

এধরনের আরো অনেক গল্প শুনেছি পশ্চিমবংগের মানুষ নিয়ে। আমার বন্ধু কবি সোহেল অমিতাভের সংগে কলকাতার এক প্রথিতযশা কবির বেশ দহরম-মহরম ছিলো। কবির দু'মেয়ে আর তাদের শশুর-গলগ্রহ জামাই সোহেলের ঢাকা বাসায় দিব্যি একমাস কাটিয়ে গেলেন রাজকীয় আতিথ্যে। সোহেলের তখন রমরমা ম্যানপাওয়ার ব্যবসা। সদ্য বিয়ে করেছেন বেবী নাজনীনকে। দিনে নামী-দামী হোটেলের খাবার আর রাতভর ব্যাক লেভেলে ডুবে থাকার মধ্যেই একসময় তাদের বাংলাদেশ ভিসা শেষ হলো। আমি তখন সোহেলের বাসায় থাকি। ফলে আমার কপালেও মিলেছে রাজসিক ভোজন। বছর খানেক পর সোহেলসহ আমরা কলকাতা গেলাম মঞ্চ নাটক দেখতে। আমাদের মাথায় তখন গ্রুপ থিয়েটারের ব্যারাম। সপ্তাহ খানেক ছিলাম, কবি পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত আমাদের হোটেলে আসা-যাওয়া করেছে। আমাদের ডিউটি ফ্রি ব্যাক লেভেলগুলো সাবাড় করে গেছেন নির্দ্বিধায়। কিন্তু ভুলেও একবার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেননি।

অবশ্য ব্যতিক্রম পেয়েছিলাম ক্যাপটেন হ্যারি বোসকে। হংকংয়ের একটা শিপিং কোম্পানীতে কাজ করতেন। দিব্যি ফূর্তিবাজ টাইপের। স্ত্রী-কন্যা কলকাতায় রেখে উনি থাকতেন ফিলিপিনো গালফ্রেন্ডের সাথে। দু'হাতে টাকা না উড়ালেও খরচ করার মানসিকতা ছিলো। একবার উনি বিনাদ্বিধায় আমাকে এক লাখ হংকং ডলার ধার দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের একটা পা কেটে ফেলতে হয়েছে ২০০০ সালে। তারপর থেকে উনি কলকাতায় থাকেন। ২০০৩ সালে আমাকে একবার মুম্বাই ও চেন্নাই যেতে হয়েছিলো। হ্যারি বোসের সংগে দেখা করার জন্যেই আমি কলকাতায় যাত্রা বিরতি নিয়েছিলাম। আমার সংগে ছিলেন আমার আরেক জাহাজী বন্ধু ক্যাপ্টেন আমির।

হ্যারি বোস ও আমি পরস্পরকে দাদু বলে ডাকি। দাদু কোনভাবেই আমাদের হোটেলে উঠতে দিলেননা। টেনে নিয়ে গেলেন বাড়ীতে। তখন দুপুর। টেবিলে খাবারের আয়োজন দেখে ক্যাপ্টেন আমিরের চোখ ছানাবড়া। তার পুর্বপুরুষরা বায়ান্ন সালে কলকাতা থেকে ঢাকা গিয়েছেন তবু স্বভাবে-চলনে আমিরের গায়েও তখনো কলকাতার গন্ধ! রাতে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন দামী এক খাবার খাওয়াতে। ভাবতে ভালোলাগে পশ্চিমবংগে ক্যাপ্টেন হ্যারি বোসের মতো উদার দাদুও আছেন। কারণ সব সমাজেই দু'একটা ব্যতিক্রম থাকে।

পশ্চিমবংগের সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত লেনদেন কিংবা উঠাবসা নেই। তবে মেলবোর্ণে এসে আবার পশ্চিমবংগের নিয়ে পড়তে হলো। পশ্চিমবংগের দাদা-দিদিরা নিজেদের বাংগালী ও বাংলা সংস্কৃতির পথিকৃৎ দাবী করে থাকেন ভাবসাবে। বাংগালীদের আয়োজনে ও খরচায় অনুষ্ঠানগুলোতে দেখি মাইক্রোফোন হাতে উনাদের লম্ফঝম্ফ। শুনি ওনাদের অনুষ্ঠানের টিকেট বিক্রি করতে উনারা বাংগালীদের শরণাপন্ন হন (বাংলাদেশের মানুষই বাংগালী, পশ্চিমবংগের বাংলাভাষীরা বাংগালী নয়, হিন্দি-বাংলার খিচুড়ি মেলানো ভারতীয়। বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারলেই যদি বাংগালী হওয়া যেতো তাহলে ইংরেজীভাষী অজি ও আমেরিকানদের বলতে হবে ইংলিশ)। বাংলাদেশের মানুষ না গেলে কলকাতা থেকে আনা শিল্পীদের পারিশ্রমিকের টাকা উঠেনা- টিকেট বিক্রির সময় সেকি সমধুর সুর, দাদা আমাদের অনুষ্ঠানে আসছেন তো? কিন্তু বাংগালীদের কোন অনুষ্ঠানে উনারা টিকেট কেটে আসেন না, যদিওবা আসেন সর্বোচ্চ হাতে গোনা পাঁচ-ছয়জন।

ভাবখানা এমন (বাংলাদেশের) বাংগালীরা নমশূদ্র আর পশ্চিমবংগের উনারা ব্রাহ্মণ। কেবল কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি? সামাজিকভাবে উদার বাংগালীরা উনাদের পুজোয় যায় শুভেচ্ছা জানাতে। উনারা শিখেননা সামাজিক সম্পর্কের রীতিনীতি। আমাদের উনারা সম্মান করেন দাদা-বৌদি ডেকে। তবে আমরা নারায়ণ ভাই ও কল্যাণী ভাবী ডাকলে উনাদের সম্মানে লাগে। আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে এলে উনারা বলেন, বৌদি একটু জল দেবেন। আমরা যদি আমাদের বাড়ীতেই উনাদের উপস্থিতিতেই বলি ভাবী পানির জগটা দিন না, ওনাদের অপমানে লাগে। উনাদের কেনো এতা নাক উঁচু ভাব?

পশ্চিমবংগের মানুষ নিয়ে আরেকটা গল্প বলেছিলেন। একটি দৈনিকের ক্রীড়া সাংবাদিক। ইডেনে ভারতের সাথে খেলছিলো ওয়েষ্ট ইন্ডিজ। বাজে একটা শর্ট খেলতে গিয়ে শচীন অল্প রানে এলবিডাবলু। দেখে এক পাড়াতো দাদা বলে উঠলেন, কি বাজে শর্টটাই না খেললো শচীন, ওকে বলতে হবেতো। ভাবখানা এমন একটু পরেই উনার সাথে শচীনের দেখা হয়ে যাবে। পশ্চিমবংগের মানুষের আর যা-কিছুরই ঘাটতি থাকুক ভাব-ভংগিমার ঘাটতি নেই। আমরা ড্রাইভারদের জন্যে সেমাই-সুজি রান্না করি। ওনারা সেই সুজির হালুয়াকে আহলাদে বলেন, মোহনভোগ। আজ কি দিয়ে খেলেন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন, সকালে ছাতু দিয়ে লংকা (কাঁচা মরিচ) মারলাম আর দুপুরের আস্ত ডিমের আর্ধেক দিয়ে ভাত। অর্ধেক ডিমের ব্যাপারটা ঢাকা পড়ে থাকে 'আস্ত ডিমের' আবরণে। নিঃস্ব দীনহীন গরীব বাংগালী যখন তীব্র অভাবে থাকে তখনো বাধ্য না হলে কাঁচা মরিচ দিয়ে শুকনো আটা খায়না। আর তারা পর্বের সাথে তা উচ্চারণ করে ব্যাপারটিকে কৌলিন্য দিতে চান।

একবার এক বাসায় দাওয়াতে গেছি। সেখানে পশ্চিমবংগের এক ভাবী ছিলেন। চিংড়ির চর্চারি দেখে উনার সেকি উলাস। বৌদি এতো বড় চিংড়ি পেলেন কোথায় বলুন। বড় সাইজের চিংড়ি না পেয়ে এগুলো এনেছেন বলে এতক্ষণ হোষ্ট পরিবারের মধ্যে ঠান্ডা মন কষাকষি চলছিলো। কলকাতার ভাবী যে সাইজের চিংড়ির কথা বলছিলেন, স্প্রিংভ্যাল বাজারে সেগুলো গড়াগড়ি খায়। কত অপ্রশস্থ হৃদয়! দশ ডলার খরচ বাঁচাতে কত কোমরবাঁধা কসরত, এতে যদি শিল্প-সংস্কৃতি গোলায় যায়তো যাক। এই একতরফা ব্যাপারটার অবসান হওয়া দরকার। অনেকে হয়তো বলবেন, কেন উনারা সেদিনতো বাংগালীদের অনুষ্ঠানে গিয়েছেন বন্যার গান শুনতে। আসলে উনারা বন্যাকে নিজেদের একজন ভেবেই গেছেন। একেতো রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী তার ওপর শান্তি-নিকেতনের ছাত্রী, বন্যার অনুষ্ঠানেতো উনারা যাবেনই। উনারা গেছেন বাংগালী বন্যার কৃতিত্ব নিজেদের দাবী করতে, শত হোক ওপর শান্তিনিকেতনের ছাত্রী।

জানি কেউ কেউ বলবেন আমি অত্যন্ত নীচুমনা একজন মানুষ। একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। বলুন তাতে কোন দুঃখ নেই, তবে তার আগে মনে করে দেখুন বাংগালীদের কোন অনুষ্ঠানে পশ্চিম বংগের কুড়ি জন মানুষ টিকেট কেটে এসেছেন কিনা।----(চলবে)

দুরবীনে ভাসা জীবন-৭

দেশপ্রেম!

মাদ্রাসার পাঠ শেষে দাদাজান এন্ট্রাস পাশ দেন অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী কলকাতায়। আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমেদের মুক্তচিন্তার আহ্বানে যে কজন আরবী শিক্ষিত অগ্রগামী হয়েছিলেন, দাদাজান তাঁদেরই একজন। তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিলো সমাজ সংস্কারক শেরে বাংলা, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার। তিনি জেনেছিলেন মানবধর্ম পালনই মুখ্য। সংগতকারনেই তাঁর মেধা-মননে প্রনিধানযোগ্য হয়েছিলো স্বদেশী ও স্বদেশ।

জীবন-জীবিকার তাগিদে মাদ্রাসা শিক্ষতাকেই পেশা মেনে নেন তিনি। সমাজমনস্ক ও রাজনীতিমুখী হলেও তিনি রাজনীতির খরস্রোতা নদীতে সাঁতার দেননি। গান্ধীজির অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস কিংবা জিন্নাহ্‌র ধর্মীয় মুসলিমলীগ, কোনটাই তাকে নিজ শিবিরে টেনে নিতে পারেনি। ধর্মপ্রাণ নিবেদিত মুসলমান হিসেবে জিন্নাহ্‌ ও মুলিম লীগের প্রতি তাঁর হয়তো প্রছন্ন ও সুক্ষ্ম মমত্ব ছিলো কিন্তু সেই হৃদয়জ দুর্বলতা তাঁর বিচার-বিবেচনাকে গ্রাস করেনি।

ভারতবর্ষকে দাদাজান জেনেছিলেন স্বদেশ। ভারতবর্ষের মানুষকে স্বদেশী। তাই সাতচল্লিশের দেশ বিভক্তিতে তিনি কেঁদেছিলেন আকুল। কলকাতা হারানোর বেদনায় তাঁর দু'চোখের উঠোনে নেমেছিলো অশ্রুবান। জন্মস্থান কুমিল্লা আর আশ্রয়স্থল কলকাতা, দুটোই ছিলো তাঁর স্বদেশ, জননী ও সন্তানের মতো অবিকল। সন্তানের বিপক্ষে জননী কিংবা জননীর বিপক্ষে সন্তান, কোনটাই গ্রহণযোগ্য মেন হয়নি মুক্তপ্রাণ মানুষটির কাছে। তাই আমৃত্যু ভেসেছেন দেশ বিভাজনের কষ্টকর স্মৃতিতে।

বাবা, তারুন্যের দিক বিবেচনাহীন আতিশয্যে, দাদাজানের কলকাতার বদলে চেয়ে নিয়েছিলেন কুমিল্লা। বাবার এ-প্রেম যেন কিশোরীর প্রেমে বিভোর তরুনের জননীর আঁচলের মায়া ছেড়ে আসা। গান্ধীজির অহিংস প্রেম মন্ত্রমুগ্ধ করেনি তাঁকে, আকণ্ঠ মোহমুগ্ধ করেছে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ছলনা, অথচ ছিলেন মুক্তমনা প্রগতিশীল। কী

অদ্ভুত বৈপরিত্যের সহবাস! এ-যেন দুই ভিন্ন ভাষাভাষীর সমন্বয়ে গড়ে উঠা আজব পাকিস্তান। স্ববিরোধিতার উজ্জ্বল উপমা পাকিস্তানের প্রতিচ্ছবি ছিলো বাবার জীবনযাপন।

বাবা ছিলেন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানে ফিটফাট স্যুটপরা কেতা দুরস্ত বৃটিশ। মিশনারী স্কুলে কণ্ঠস্থ করা অভ্যস্থ ইংরেজীই ছিলো তাঁর সহজাত উপস্থাপন মাধ্যম। তবুও তিনি কখনো মাতৃভাষা বাংলাকে দুরে ঠেলে দেননি অবহেলা অনাদরে। বরং মাতৃভাষাকে জেনে ছিলেন জননীর মতো অভিন্ন; পুজোর আসনে রেখে বাংলাভাষাকে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি। ফলতঃ বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন তাকে কেবলমাত্র প্রভাবিত করেনি, বরং নতুন প্রজন্মেও নিবেদিত দেশ ও সংস্কৃতি প্রেম করেছিলো মুগ্ধ ও বংশবদ। তিনি গর্বিত হতেন বাঙ্গালী পরিচয়ে। একেই কী বলে নাড়ির টান, শেকড়ের মমতা!

একাত্তরে ঈশ্বরতুল্য পাক-প্রভুদের হানাদারের ভূমিকায় সক্রিয় ও নির্লজ্জ হতে দেখে বাবা হয়ে পড়েন নির্বাক, বিবর্ণ ও পঙ্গু। বানভাষী মানুষের মতো সর্বস্ব খোয়ানোর শোকে বিরহী ও দুঃখী হন- এই বিরহ ও দুঃখ, প্রাণপ্রিয় পাকিস্তান খোয়ানোর কষ্টকর কষ্টের জন্যে। অমোঘ মৃত্যুর সাদৃশ্যে তিনি বুঝেছিলেন তাঁর প্রিয় 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ও চাঁদ তারা সবুজ পতাকা অচিরেই ঝুলবে স্মৃতির ফ্রেমে। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর পুরো বাংলাদেশ যখন বিজয় উল্লাসে মত্ত, তখন বাবার দু'চোখের কার্ণিশ বেয়ে হয়তো ঝরেছিল কয়েক ফোটা অশ্রু। সেটা কী ছিলো বিজয়ের আনন্দাশ্রু? নাকি তারুণ্যের প্রথম প্রেম, চাঁদতারা পাকিস্তান খোয়ানোর শোক? জানা হয়নি। পয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে যে লাহোর ও করাচী ছিলো বাবার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সরব, একাত্তরে সেই লাহোর ও করাচী, তাঁর স্মৃতিতে পরস্ত্রীর মতো সুদুর ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে নিমিষেই। তিনি কী তখন দাদাজানের কলকাতা হারানোর কষ্টের সংগে একাত্ম হয়েছিলেন? তাঁর অনুভবে এসেছিলো নাড়ির টান ছিন্ন হবার কষ্ট?

তৃতীয় পুরুষে এবং /অথবা প্রজন্মে আমি, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সন্তান বাঙ্গালী, নিদারুন অবহেলায় মোহময়ী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় অবলিলায় উপড়ে ফেলি নাড়ির টান। আশ্চর্য, রক্তাক্ত ও অপমানিত হবার বদলে হই গর্বিত। পুর্বপুরুষদের নাড়ির টান স্বইচ্ছায় স্বজ্ঞানে ছিন্ন করার অবমাননার লজ্জা স্পর্শ করেনা চোখ। বিপরীতে পুর্বপুরুষেরা সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক স্বার্থপর প্রক্রিয়ায় বাধ্য হয়েছিলেন ছিন্ন করতে নাড়ির টান। সমকাল পুর্বপুরুষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গ্রাহ্যে আনেনি। আমার জীবনযাপনে মানচিত্র বদলের পরিক্রমার সিদ্ধান্ত ছিলো স্বজ্ঞান ও স্বইচ্ছা প্রসুত।

পরবাসকে নিজ বাসভুমে রূপান্তরের স্বপ্নাপ্লুত প্রচেষ্টার প্রক্রিয়ায় যখন অজি হবার শপথে ব্যতিব্যস্ত আমার চিন্তা-চেতনায় কেননা জানিনা বারবার লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশ উঁকি মারছিলো। পুর্ণতার প্রত্যাশায় কাতর হৃদয়ে কেন জানিনা অনুভুত হচ্ছিলো অপুর্ণতার রাহুগ্রাস। পাশে দাঁড়ানো 'মাইট' সন্তানের চোখে মুখে তখন প্রাপ্তির আনন্দ আভা হয়তো এই প্রাপ্তি হিতাহিত জ্ঞানহীন অবুঝ স্বপ্নের সিঁড়ির সন্ধান। কিন্তু প্রাণপ্রিয় সন্তান আমার কী উপলব্ধি করতে পেরেছিলো সন্তানের মঙ্গল কামনায় পিতার দেশপ্রেম বিসর্জনের সতীদাহ? পারবে কোন দিন?

নিজের নাড়ি ছিন্ন করা বেদনাতুর প্রসবে, সন্তানের জন্যে নির্মাণ করেছি 'নিজস্ব নাড়ি টান'- সে যেন অবিকল আমার কৈশোরের আদল। একাত্তরে বাবার 'বাধ্যতামুলক' দেশ হারানোর কষ্ট যেমন আমার অনুভবে ধরা দেয়নি, তেমনি আমার বাবার বোধেও করাঘাত করেনি দাদার কলকাতা হারানোর রক্তক্ষরণ প্রবাহ। এটাই বোধ করি জীবনের শ্বাশ্বত সত্য।

পিতামহ আমার নিশ্চিত ক্রিকেটের নাম এবং গুণগান শুনেছেন, তবে দেখেছেন কি খেলাটা? বোধকরি না। ক্রিকেটপ্রেমী হলে তিনি কোন দেশের সমর্থক হতেন? হারানো ভারতের, না আরোপিত প্রাপ্তি পাকিস্তানের? ক্রিকেটের মোহমুগ্ধ-প্রেমী বাবা ছিলেন পাক-ক্রিকেট দলের একনিষ্ঠ সমর্থক ও গুণগ্রাহী। তাঁর জীবদ্দশায় পাক-ক্রিকেট দল বাংলাদেশী টাইগারদের মোকাবেলা করেন নি। যদি দু'টো দল মুখোমুখি হতো প্রতিযোগিতার প্রতিপক্ষে, তিনি কোন দেশী দলকে সমর্থন করতেন? হারিয়ে ফেলা পাকিস্তান না কষ্টার্জিত বাংলাদেশী দলকে? জানা হয়নি এ সকল অমীমাংসিত রহস্যের ঠিকানা।

কেবল জানি, হাজার ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন মাঠে নামে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মোকাবেলায়, আমার রক্ত শিরা-উপশিরায় তখন নাচন নামে উৎকণ্ঠার-আশংকার। ম্যাচ জেতার সম্ভাবনাহীন অসম্ভব প্রত্যাশায় অধীরতা সকল প্রতিকূলতাকে নিমিসেই টেনে নিয়ে আসে অনুকূলে। অজিরা যখন ক্রিকেট মাঠে নামবে দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পারদরেখা যা কি একই সমতটে থাকবে? জানিনা। প্রবাসী স্বদেশ, অস্ট্রেলিয়া, যখন 'খোয়ানো জন্মভূমি' বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে বাইশ গজী পীচে, তখন আমার

হৃৎকম্পন কার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনারত হবে? আমি ও আমার সন্তান তখন কি কষ্ট মুখোমুখি ও ভিন্ন পক্ষ হবো? মুখোমুখি হবে আমাদের স্বদেশ-প্রীতি ও দেশ প্রেম! ভিন্ন নাড়ির টানে পিতা ও সন্তান প্রবাহিত হবো ভিন্ন খাতে, মুখোমুখি প্রতিপক্ষে? জানি না, জানা হয় না। ----(চলবে)

দুরবীনে ভাসা জীবন-৮

গ্রাম্য রাজনীতি

রক্তসম্বন্ধীয় না হলেও তসলিম কাকা (দের) সাথে আমাদের সম্পর্কটা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও নিবিড়। আমাদের সম্পর্ক দুই প্রজন্মের। আমার বাবা আর উনার বাবা আগা নওয়াবুর রহমান অবিভক্তবংগ দেশের কলিকাতায় একই মেসে থেকে একই কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ দিয়েছিলেন। দু'জনেরই জীবন শুরু সরকারী চাকুরী দিয়ে। উনি প্রশাসনে আমার বাবা খাদ্য বিভাগে। আমার বাবা সরকারী চাকুরীতে ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে পাঁচ-ছয় বছরের মাথায় ইস্তফা দিয়েছিলেন। উনি লেগে ছিলেন। অতিরিক্ত সচিব হয়ে চাকুরী জীবনের পর্দা টেনে ছিলেন। দু'জনের সম্পর্কটা বন্ধুর হলেও বাবা উনাকে মামা ডাকতেন। আমরা ডাকতাম ননু দাদা। ননু উনার ডাকনাম।

জন্ম থেকে দেখে আসছি দু'টো পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধন। যদিও দু'টো পরিবারের বাড়ী একই গ্রামে, তবু যোগাযোগের ভিত্তিটা কখনই গ্রামভিত্তিক বা কেন্দ্রিক ছিলোনা। কালে-ভদ্রে তসলিম কাকারা দেশে বেড়াতে আসতেন। আমরাও একই কাজ করতাম। বোধকরি আমরা হয়ে উঠেছিলাম শহুরে মধ্যবিত্ত। তসলিম কাকার বাবা আগা নওয়াবুর রহমান ছিলেন আপাদমস্তক একজন নির্ভেজাল সহানুভূতিশীল মানুষ। মানুষের হাসি ও ব্যবহার এতোটা শিশুসুলভ হতে পারে উনাকে না দেখলে বিশ্বাস হতে চাইবেনা। আমাদের বাসায় উনার আগমন মানেই ছিলো আনন্দ আর ফূর্তির জোয়ার। দুর্ভাগ্য, উনি যখন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক তখন উনার স্ত্রী মানে দাদী অনেকগুলো মাটির সাথে গড়াগড়ি দেয়া সন্তান রেখে পরকালের উদ্দেশে ওয়ানওয়ে টিকেট কেটে ফেলেন। ননু দাদা সন্তানদের দিকে তাকিয়ে একাকী জীবন পার করে দিয়েছিলেন।

তসলিম কাকা আমার বড় ভাইয়ের সমবয়সী। উনার মা যখন মারা যান তখন বোধকরি উনি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। বাবার বদলীর সরকারী চাকুরীর কারণে উনারা তখন চাটগাঁয় মামার বাসায় থাকতেন, উনার মামা চাটগাঁর বিখ্যাত কামাল কন্ট্রাকটরের বাসা আমাদের বাসার কাছাকাছি ছিলো। দুরত্বের সুবিধার কারণেই আমাদের ঐ বাসায় প্রতিদিন যাওয়া হতো। তসলিম কাকার একমাত্র মামী রবীন্দ্রনাথের 'ফটিকের মামীর' একেবারেই উল্টো ছিলেন। তিনি মামী ছিলেন না মা ছিলেন, বোঝার কোন জো ছিলোনা। মামীর সীমাহীন আদরের পাশাপাশি দেখেছি ছোট ভাইবোনদের জন্যে তসলিম কাকার আন্তরিক মমত্ববোধ। তিনি একই সংগে পিতা ও মাতা দু'টোরই দায়িত্ব পালন করতেন। ভাই-বোনেরা ছিলেন উনার বন্ধু।

সত্তর-আশি দশকে বাংলাদেশে যারা শিল্প-সাহিত্যের সাথে অল্প-বিস্তর জড়িত তারা নিঃসন্দেহে এই মহৎপ্রাণ মানুষটিকে চিনে থাকবেন। শাহবাগের বিখ্যাত রাগীবের 'রেখায়ন'-এ ছিলো উনার আড্ডা। শুনেছি উনি এখনো নিয়মিত আড্ডা মারেন ধানমন্ডিতে রফিক আজাদ, মাকিদ হায়দারদের সাথে। বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও শিল্প-সাহিত্যের সুবাদে তসলিম কাকার সাথে খোলামেলা মেশার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি নিজে কখনো লেখালেখি করেননি, কিন্তু উনি ছিলেন সচেতন ও নিবেদিত একজন পাঠক। লেখকগোষ্ঠি নিজের লেখা সম্পর্কে কোন আন্তরিক ও খোলামেলা মতামত চাইলে তসলিম কাকার শরণাপন্ন হতেন। আমার বিচারে উনি একজন উঁচু মাপের মানুষ ও বুদ্ধিজীবী।

তসলিম কাকার সংস্পর্শে এসে অনেক শিখেছি। জীবনকে দেখার ও উপভোগের ভিন্ন দৃষ্টিভংগির সাথে পরিচিত হয়েছি। উনি ছিলেন হাঁসের মতোন। সারাক্ষণ পানিতে ভিজলেও দুঃখ-কষ্ট উনাকে ভিজিয়ে দিয়ে যেতে পারতোনা। হাঁসের শুকনো পালকের মতোই থাকতেন তিনি। একই গ্রামের সন্তান বলেই হয়তো কবি কামাল চৌধুরী ও আমার প্রতি উনার ব্যক্তিগত সহানুভূতি অপ্রকাশ্য থাকতো না। উনি কথাও বলেন চমৎকার- হালকা রসাত্মক কথা বার্তার মাঝে গভীর একটা মর্মার্থ থাকতো।

উনারা আগা বংশ, সম্ভবতঃ বাংলাদেশের একমাত্র বাংলাভাষী আগা উনারা। নিজের বংশ পরিচয় নিয়েও তসলিম কাকা বেশ হাস্যরস করতেন। বিয়ে-শাদীর দাওয়াতে বেয়ারারা জোঁকের মতো লেগে থাকে বকশিশের বিনিময়ে হাত ধোঁয়ানোর খোঁজে, যেন হাত ধোঁয়ানোটাই মুখ্য। উনি এত বেশ মজা পেতেন।

পঞ্চাশ-একশ টাকা বকশিশ দিয়ে হলেও পুরো টেবিলের মানুষকে উনি বেয়ারা দিয়ে হাত ধোঁয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। উনার যুক্তি অদ্ভুতঃ এখনতো আর বংশ মর্যাদা দেখানোর আর কোন জায়গা নেই। বাড়ীতে এখন যে কেউই দালান তুলতে পারে। ডিগ্রীধারী মানুষের অভাব নেই। পয়সা থাকলেই ছেলেমেয়েদের নামী-দামী স্কুলে পাঠানো যায়। কোন কাজের আগে মানুষজন বংশ পরিচয় জানতে চান না। এমতাবস্থায় বংশ মর্যাদার পরিচয় প্রকাশের কোন উপায় নেই। বিয়ে বাড়ীতে বেয়ারা যখন সাবান-গরম পানি দিয়ে হাত ধুঁইয়ে দেয়, তখন নিজের মধ্যে একটা নবাবী ভাব আসে- মনে হয় সত্যি আমি আগা বংশীয়।

উনার দু'জন চাচা গ্রাম-কেন্দ্রিক ছিলেন। লেদু দাদা কখনো শহরে নোংগর ফেলেননি। তিনি ছিলেন আমাদের এলাকার পোষ্টমাষ্টার। খুবই সম্মানী একজন মানুষ। কখনো কোনো চায়ের দোকানে বসেননি। তবে গ্রামে টিকে থাকতে হলে প্রভাবশালীদের সংগে তাল মিলিয়ে না-চলার মতো বাস্তবজ্ঞানবর্জিত ছিলেন না। সেকারণেই মাঝে মধ্যে কিছুটা বিতর্কিতও হয়েছিলেন। তিনি দোষগুন মেশানো একজন আদর্শ মানুষ। অন্যজন আশু দাদা শহর আর গ্রামের মাঝে নিয়মিত শার্টেল করতেন। তিনি বোধকরি সাত-আট ক্লাসের জন্যে মেট্রিকের গন্ডি পেরুতে পারেন নি। তবে কথাবার্তা বলতেন ছাপার অক্ষরে। কথা শুনলে মনে হবে তিনি কোন কলেজের বাংলা প্রভাষক। আমার আব্বার উনি ছিলেন কলিজার টুকরো। উনার কল্যাণেই আমার আব্বা কিছুদিন মির্জা গালিবে মজেছিলেন। উনার কূটবুদ্ধির দক্ষতাকে অগ্রাহ্য কিংবা অস্বীকার করার মতো মানুষ আমাদের তল্লাটে নেই। হেন কাজ নেই যেটা আশু দাদা করতে পারতেন না। উনাকে যদি কেউ কোন দায়িত্ব দিতেন, তিনি ধরেই নিতেন কাজটা সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

নিজের চাচা ও চাচার গ্রাম্য মাতবরদের সম্পর্কে তসলিম কাকার একটা নিজস্ব থিওরী আছেঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্বল যোগ্য কূটনৈতিকের অভাবে। আমাদের গ্রাম্য টাউটদের যদি 'ভাষা শিখিয়ে' চীন-রাশিয়া-আমেরিকায় পাঠানো যেতো, তাহলে সেসব দেশের কূটনীতিবিদরা বুঝতেই পারতেন না কি দিয়ে কি হয়ে গেলো। আমাদের সুদক্ষ গ্রাম্য টাউটরা তাদের ঘোল খাইয়ে ছাড়তেন। তিনি নিজের স্বার্থেই এসব প্রতিভাধরদের থেকে দুরে থাকতেন। আমাদেরও দুরে থাকার পরামর্শ দিতেন। আব্বার মৃত্যুর পর পারিবারিক বিষয় সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে এ- সকল প্রতিভাধরদের সাথে আমার বেশ কয়েকবার মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভয়াবহ সেইসব অভিজ্ঞতা। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বেঁচে থাকলে কখনো এধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসবোনা।

কুড়ি বছরের প্রবাস জীবনে প্রথম দিকে এধরনের কোন মানুষের দেখা না পেয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম। অবশ্য মাঝেমধ্যে দু'একটা উঁকিঝুঁকি যে পাইনি তা নয়। তবে এসব ঘাই ছিলো পুঁটি মাছের ঘাই, রাঘব-বোয়ালের নয়। বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনেছি সিডনী হচ্ছে রাঘব-বোয়ালের মেলা। উনারা যদি দয়া করে কিছু চেয়ে বসেন, আমাদের মতো আমজনতাকে তাতে সায় দিতে হয় বারবার বিরক্ত হবার ভয়ে। এখানে, মেলবোর্ণেও মাঝে মধ্যে রাঘব-বোয়ালের ঘাঁই দেখি। বড় ভয় লাগে। দুধ খেয়ে যার মুখ পুড়েছে, সে-তো দইতে ফুঁ দিতে ভয় পাবে। পাবে না?

পুঁটি মাছের ঘাই, রাঘব-বোয়ালের নয়। বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনেছি সিডনী হচ্ছে রাঘব-বোয়ালের মেলা। উনারা যদি দয়া করে কিছু চেয়ে বসেন, আমাদের মতো আমজনতাকে তাতে সায় দিতে হয় বারবার বিরক্ত হবার ভয়ে। এখানে, মেলবোর্ণেও মাঝে মধ্যে রাঘব-বোয়ালের ঘাঁই দেখি। বড় ভয় লাগে। দুধ খেয়ে যার মুখ পুড়েছে, সে-তো দইতে ফুঁ দিতে ভয় পাবে। পাবে না?

E-Mail: abid.rahman@ymail.com